যা পড়ি তা বুঝতে হবে

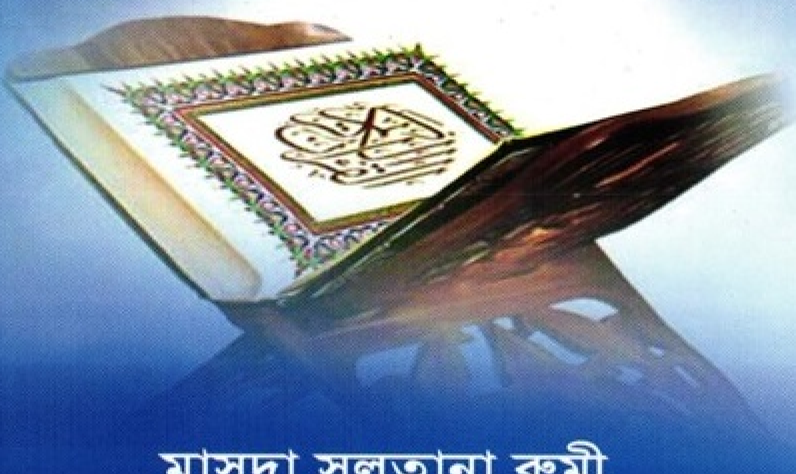

মাসুদা সুলতানা রুমী

যা পড়ি তা বুঝতে হবে

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

যা পড়ি তা বুঝতে হবে

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ
০১৭১৫২৪৯৯৮৬

প্রকাশকাল
জানুয়ারি - ২০১৪
পৌষ - ১৪২০
রবিউল আউয়াল - ১৪৩৫

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

♦ **তাসনিয়া বই বিতান** ♦ **প্রফেসর বুক কর্ণার** ♦ **প্রীতি প্রকাশন** **প্রফেসর পাবলিকেশন** ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা

♦ **ঢাকা বুক কর্ণার** ♦ **মহানগর প্রকাশনী** ♦ **তামান্না পাবলিকেশন** ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা

♦ **আহসান পাবলিকেশন**, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা

♦ **আহসান পাবলিকেশন**, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

♦ **আহসান পাবলিকেশন**, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

♦ **আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী**, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম

♦ **ঝিম ঝিম প্রকাশনী**, ৪২ বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ। ছয়টি প্রবন্ধ নিয়ে বইটি সাজালাম। প্রবন্ধ কয়টি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ভারতের 'মিজান' পত্রিকায়। যাহোক প্রবন্ধগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমি গুছিয়ে মালার মতো গেঁথে দিলাম। সহৃদয় পাঠক, ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর এই পুস্তিকা যেন হয় আমার নাজাতের উসিলা। আমীন॥

মাসুদা সুলতানা রুমী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- যা পড়ি তা বুঝতে হবে ০৫
- খতমে কুরআন ০৭
- আহনাফ বিন কায়েসের ঘটনা ০৮
- বিভিন্ন দোয়া ১১
- কাফের ও মুমিনের পার্থক্য- নামাজ ১২
- দুনিয়য়াতে পাঁচটি ১৪
- মৃত্যুর সময় তিনটি ১৫
- কবরে তিনটি ১৫
- পুনরুত্থানের সময় তিনটি ১৫
- নামাজে ধীর স্থিরতা ও একাগ্রতা ১৫
- আসুন আমরা নামাজী হই ১৭
- মিরাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা ১৮
- সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ১৪টি নীতি ১৯
- মহিলা সাহাবীদের ত্যাগ ২২
- উম্মে সুলাইম (রা:) ২৪
- বুদ্ধিমতী নারী- সাফনা বিন্তে হাতিম ২৮
- রাসূল (সা:) এর আনুগত্যে নারী ৩০

www.pathagar.com

যা পড়ি তা বুঝতে হবে

আমরা বই প্রস্তুক, গল্প-উপন্যাস, চিঠি-পত্র, পেপার-পত্রিকা যা-ই পড়ি না কেন তা বুঝেই পড়ি। 'বুঝ' গ্রহণ করাই পড়ার উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে একমাত্র কুরআন মাজিদ ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা লোকেরা পড়ে কিন্তু বোঝে না। মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা তাঁর রাসূল (সা:) এর মাধ্যমে মানুষের জন্য প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো 'পড়'। অর্থাৎ পড়াই হলো জানার প্রধানতম মাধ্যম। তার মানে আল্লাহকে জানতে তাঁর আদেশ নিষেধ হুকুম আহকাম জানতে, এমনকি দুনিয়ার যে কোনো বিষয় জানতে ও বুঝতে পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

ত্রিশ পারা কুরআন মজিদে অনেক কথা অনেক ঘটনা আছে। যারা না বুঝে সুর করে শুধু দুলে দুলে কুরআন মজিদ পড়ে তারা কি বোঝে? তারা কোনো ঘটনা, কোনো আদেশ, কোনো নিষেধ, কোনো উপদেশ কিছুই বোঝে না। শুধু বোঝে যা পড়ছি এর প্রত্যেক অক্ষরের জন্য দশটা করে নেকী পাবো।

কুরআনের আদেশ নিষেধগুলো পড়লাম কিন্তু তা বুঝলামও না সে অনুযায়ী কাজও করলাম না। কুরআনের উপদেশগুলো কেউ পড়ল কিন্তু তা বুঝল না মানলও না তাহলে এই পড়ায় কি করে সওয়াব বা নেকী পাওয়া যাবে?

বরং এই ধরনের পাঠকদের জন্য কুরআনের অভিশাপ বর্ষিত হবে। আল কুরআন এদের বিরুদ্ধে শাফায়াত করবে। কুরআন পড়তে হবে জানার জন্য, বোঝার জন্য এবং মানার জন্য। যারা এইভাবে কুরআন পড়বে কুরআন তাদের পক্ষে শাফায়াত করবে। এদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন বললেন, আমার উম্মতদের মধ্যে কিছু আল্লাহ ওয়ালা লোক আছে।"

লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ওয়ালা লোক বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন?

তিনি বললেন, 'কুরআন ওয়ালা লোকেরাই হলো আল্লাহ ওয়ালা এবং তারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা।' (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

'আহলুল কুরআন' বলতে সে সব লোকদের বুঝায় যাদের কুরআনের প্রতি রয়েছে গভীর আকর্ষণ, তারা কুরআন পড়ে এবং পড়ায়। তার উপর চিন্তা গবেষণা করে এবং তার থেকে জীবন চলার পথ খুঁজে পায়।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "আল কুরআনে পাঁচ রকমের আয়াত আছে। হালাল,

www.pathagar.com

হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমসাল। তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ কর, হারামকে হারাম জেনে বর্জন করবে, মুহকাম অনুযায়ী আমল করবে, মুতাশাবিহর উপর ঈমান আনবে এবং আমসাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।"

লোকেরা বলল, মুহকাম, মুতাশাবিহ এবং আমসাল আমাদের বুঝিয়ে দিন। রাসূল (সা:) বললেন, "মুহকাম ঐ সব আয়াত যা স্পষ্ট আদেশ নিষেধ সম্বলিত। মুতাশাবিহ ঐ সব আয়াত, যা অস্পষ্ট, রূপক আর আমসাল ঐ সব আয়াত যাতে পুরোনো দিনের ঘটনা উল্লেখ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "আমার এমন একদল উম্মত হবে যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। (অন্তরে প্রবেশ করবে না) তীর যেভাবে ছুটে বের হয়ে যায় এরাও তেমনি দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।" (সহীহ বুখারী)

আল কুরআনের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

১. "আর তাঁর (আল্লাহর) আয়াত যখন তাদের মুমিনদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (সূরা আনফাল-২) (না বুঝলে কি করে ঈমান বৃদ্ধি পাবে?

২. "পড় তোমার প্রভুর নামে।" (সূরা আলাক- ১) এই নির্দেশের অর্থ কি না বুঝে পড়া হতে পারে?

   ইবলিশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা থেকে দূরে রাখা। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার সময় শয়তান যাতে ধোঁকা দিতে না পারে সেজন্য আল্লাহ পাক বলেন

৩. তোমরা যখন কুরআন পড়বে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।" সূরা নাহল- ৯৮

৪. রমজান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সমস্ত মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট বাণীতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী।" (সূরা বাকারা- ১৫)

৫. তোমরা কি এই কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশ বিশ্বাসকরবে, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? যারা এরকম করবে, দুনিয়ায় তাদের বদলা হবে দুর্ভোগ-লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিনতম যশাস্তির দিকে।

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত হাদীস এবং কুরআনের আয়াত কয়টি পড়ার পর 'না বুঝে কুরআন পড়লেও সওয়াব আছে এই কথা বিশ্বাস করার কি কোনো অবকাশ আছে?

অথচ বিখ্যাত গ্রন্থ তাবলিগী নেছাবে ফাজায়েলে কুরআন অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত আলেম সাহেব এক রেওয়ায়েত পেশ করেছেন- "ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ আপনার দরবারে নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় উসিলা কি? উত্তর আসিল, আহমদ! সেটা আমার কালাম। আমি আরজ করলাম বুঝিয়া পড়িলে না কি না বুঝিয়া পড়িলে? এরশাদ হইল, বুঝিয়া পড়ুক বা না বুঝিয়া পড়ুক উভয় অবস্থায়ই নৈকট্যের অছিলা।"

উপরের রেওয়ায়েতটি যে ইবলিশের তৈরি করা রেওয়ায়েত তা বোঝার জন্য বিশাল জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন নেই খুব সামান্য বুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়।

রাসূল (সা:) এর হাদীস এবং আল্লাহর কালামের বিপরীতে এই স্বপ্নের দলীল কি খুব মজবুত দলীল? তবু এক শ্রেণীর মানুষ এই স্বপ্নের দলীলই মেনে চলে। আহমাদ ইবনে হাম্বল এমন স্বপ্ন দেখেননি। তার ভাষাও ছিল আরবী। তিনি তো পড়লেই বোঝেন। তিনি স্বপ্নের মধ্যে কেন জিজ্ঞেস করতে যাবেন। বুঝে পড়লে না, না বুঝে পড়লে?" তা আবার তিনি দলীল হিসাবেও পেশ করেছেন। এ কথা মানতে বিবেক বুদ্ধি সায় দেয় না।

খতমে কুরআন

আমাদের দেশে কুরআন খতমের প্রচলন আছে। আর কোনো সময় হোক চাই না হোক, রমজান মাসে। কারো কুলখানিতে কিংবা মৃত্যুবার্ষিকীতে অবশ্যই কুরআন খতম দেয়া হয়। এই কাজটা এককভাবেও করা হয় আবার ত্রিশ চল্লিশজন মহিলা একসাথে বসে ত্রিশ পারা ভাগ করে নিয়ে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে খতম দেওয়া হয়। এই ত্রিশ চল্লিশ জন মহিলার মধ্যে বেনামাজি বেপর্দা-বে রোজাদার সব ধরনের মহিলাই আছে। এদের মধ্যে খুব কম লোকেরই পড়া শুদ্ধ হয়। অর্থ বোঝার তো প্রশ্নই আসে না। মানার প্রশ্ন তো আরো পরে। এইভাবে তারা কতো খতম করে তার বহুত নেকী জমা হয়েছে বলে মনে মনে খুশি হয়। কুরআন বোঝার কথা আর মানার কথা তাদের ব্রেনেও আসে না।

www.pathagar.com

আসলে এইভাবে খতমের সিস্টেম রাসূল (সা:) তৈরী করে দিয়ে যান নি। সাহাবারা কেউ করেননি। এখনও সে দেশে কেউ করে না। রাসূল (সা:) এবং তার সাহাবাদের ভাষা ছিল আরবী। তারা শুনলেই কিংবা পড়লেই বুঝতে পারতেন কি বলা হচ্ছে কিংবা কি পড়ছি। এইজন্য আল কুরআন তাদের দুই শ্রেণীর লোকের উপরই প্রভাব ফেলেছে। যারা বিরোধী তারা চরমভাবে বিরোধীতা করেছে, মারমুখী হয়েছে। আর যারা গ্রহণ করেছে তারা কুরআনকে এমন মজবুতভাবে ধারণ করেছে যে শত অত্যাচার নির্যাতনেও কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তারা ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর, আত্মীয় পরিজন এমনকি জীবনও বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু কুরআনের শিক্ষাকে বিসর্জন দেয়নি।

আহনাফ বিন কায়েসের ঘটনা

কুরআন বুঝতে পারার একটা কাহিনী- ফি জিলালিল কুরআনের অনুবাদক ও প্রকাশক চমৎকার একটা কাহিনী তার সম্পাদকের নিবেদনে তুলে ধরেছিল। আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে তাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

"আহনাফ বিন কায়েস একজন আরব সর্দার। বীর যোদ্ধা। মহানবী (সা:)কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। হযরত আলী (রা:) এর প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। একদিন তার সামনে কেউ একজন কুরআন পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে যখন সেই ব্যক্তি এই আয়াত পড়লেন "আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে। অথচ তোমরা চিন্তা ভাবনা করোনা।" (সূরা আম্বিয়া- ১০)

চমকে উঠলেন আহনাফ। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ছিলেন। তিনি ভালো করেই বুঝলেন। যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে একথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। কেউ বুঝি তাকে নতুন কথা শুনালো। মনে মনে বললেন, আমাদের কথা? কুরআন নিয়ে এলেন, দেখি তো এতে আমার কথা কি আছে? কুরআন শরীফে একে একে তিনি বিভিন্ন দল উপদলের কথা দেখতে গেলেন। একদল লোকের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো। "তারা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায় শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে মাগফিরাত কামনা করে।" (সূরা যারিয়াত, ১৭-১৯) আবার একদল লোকের সম্পর্কে বলা হলো, "তাদের পিঠ রাতের বেলা

বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। তারা অকাতরে খরচ করে আমার দেয়া রিজিক থেকে। (হামিম সিজদা- ১৬)

আর এক দল সম্পর্কে বলা হলো, "রাতগুলো তারা কাটিয়ে দেয় নিজেদের মালিকের সিজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যদিয়ে। (আল কুরআন- ৬৫)

আর একদল সম্পর্কে বলা হলো "এরা দারিদ্র এবং স্বাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায়ই (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে। এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা মানুষদের ক্ষমা করে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের দারুন ভালোবাসেন।" (আলে ইমরান- ১৩৪)

আরেক দলের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো, "এরা বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।" (আল হাশর- ৯)

এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার পেলেন আর একদলের কথা। "এরা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জ অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে। যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) এরা মাফ করে দেয়। এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে। এরা নামায প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে। (আশ শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে জানতেন। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা তিনি বললেন, "হে আল্লাহ আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবিতো কোথাও পেলাম না। অথচ এ কিতাবে নাকি সবার কথাই বলেছ।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে নিজেকে খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হতে লাগল। প্রথম একদল সম্পর্কে বলা হলো, যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একজন পাগল ও কবিয়ালের জন্য আমাদের মাবুদদের ত্যাগ করবো?" (আস সাফফাত, ৩৫-৩৬)

আবার একদল, তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে "যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে। অথচ এদের

www.pathagar.com

সামনে যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।" (আয যুমার ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, "তোমাদের কি সে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো?" (আল মুদ্দাস্‌সির ৪২)

তারা জবাবে বলে, "আমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করতাম না। গরীব মিসকিনদের খাবার দিতাম না। কথা বানানো যাদের কাজ আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা এই শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম। এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাজির হয়ে গেল।" (আল মুদ্দাস্‌সির, ৪৩-৪৬)

আহনাফ আর কুরআনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা দেখলেন। শেষোক্তদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, "আল্লাহ এ ধরনের লোকদের উপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নাই। তিনি নিজেকে ভালো করেই চিনতেন। তিনি কোনো অবস্থাতেই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। আবার তাই বলে নিজেকে প্রথম দিকের লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়।

তার মানে ঈমানের প্রতি যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তেমনি নিজের গুনাহ খাতার স্বীকৃতিও সেখানে মজুত ছিল। কুরআনের পাতায় এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন যাকে তিনি একান্ত নিজের বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশি অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না তেমনি রবের রহমত থেকে নিরাশও ছিলেন না। কুরআনের পাতায় তেমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিল এমন একটি মানুষের ছবি তিনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন এই জীবন্ত পুস্তকে।

তিনি আবার কিতাব খুললেন। কুরআনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই আহনাফ নিজেকে উদ্ধার করলেন। তিনি কুরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেলেন। মনে মনে বললেন, "হ্যাঁ এই তো আমি!"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোক আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজ কর্ম করে কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড় দয়ালু। বড় ক্ষমাশীল। (তওবা-১২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কিতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেলেন। বললেন, এতক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহের কথা অকপটে স্বীকার করি। আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ নই।

এই কিতাবেই আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর দান থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। (হিজর- ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাড়ায় তাতো তার একান্ত নিজের ছবি। কুরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথাও তার কিতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেন নি!

হযরত আহনাফ এবার কুরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন- 'হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কিতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কিতাবে দুনিয়ার জ্ঞানী গুণী, পাপী তাপী ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সবার কথা আছে। তোমার এই কিতাব সত্যি অনুপম!

হযরত আহনাফের এই কাহিনী পড়ে আমিও নিজেকে খুঁজেছি....। আর এই খোঁজাখুঁজি করতে হলে তো কুরআন বুঝতে হবে নিজ মাতৃভাষায়। যারা বলে কুরআন বুঝে পড়ার প্রয়োজন নেই কিংবা যারা বুঝে পড়ে না তাদের দুর্বুদ্ধি দেখে অবাক হই। আর যখন আলেম নামধারীরা বলে এইসব কথা তখন দুঃখ রাখার আর জায়গা খুঁজে পাইনা।

বিভিন্ন দোয়া

আমরা বিভিন্ন দোয়া পড়ি সওয়াবের আশায়। যার কোনো অর্থ বুঝি না অথচ একটু চেষ্টা করলেই তার অর্থ আমরা বুঝতে পারি এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। চাওয়ার ও তো একটা আদব আছে। বেয়াদবের মতো চাইলে কি কিছু পাওয়া যায়?

এক সাহাবী একবার রাসূল (সা:)কে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে এমন একটি কালাম (দোয়া) শিখিয়ে দেন যা আমি সকাল সন্ধ্যা (সব সময়) পড়ব।

www.pathagar.com

রাসূল (সা:) বললেন, "তুমি পড়- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্দাহু, লা শারিকালাহু, লাহুল হামদ ওয়া লাহুল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদির। সাহাবী একটু চুপ করে থেকে বললেন, এতো সব আল্লাহর জন্য হলো, আমার জন্য কি হলো? রাসূল (সা:) তখন বললেন, ঠিক আছে তুমি এই দোয়া পড়। "আল্লাহুম্মাগ ফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়ারজুকনি, ওয়াহ্দীনি ওয়া ফিনি। সাহাবী এবার খুশী হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে আমি দুটি দোয়াই পড়ব।"

আমরা কি বুঝতে পারছি প্রথম দোয়াটি শুনে সাহাবী কেন বললেন, এতো সবই আল্লাহর জন্য- আর দ্বিতীয় দোয়াটি শুনে খুশী হয়ে দুটি দোয়া পড়তে চাইলেন?"

প্রথম দোয়াটির অর্থ "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নাই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর, সকল রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং তিনি সকল কিছুর ওপর পরাক্রমশালী।" কি হলো? সব কথাই আল্লাহর জন্য হলো না? দ্বিতীয় দোয়াটির অর্থ- "আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে রিজিক দান করো, আমাকে হেদায়াত (সুপথে) দেখাও এবং আমাকে সুস্থতা ও সচ্ছলতা দান করো।"

এবার সবই আমার জন্য হলো না?

সাহাবীর ভাষা ছিল আরবী তাই তিনি দোয়া শুনেই বুঝতে পেরেছেন এবং ঐরকম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারি, কোন দোয়াটা কি জন্য, কার জন্য?

কাফের ও মুমিনের পার্থক্য নামাজ

আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান যে নামা পড়ে না তা বেশ কিছুটা বুঝা যায় মাগরিবের নামাজের সময় বাইরে থাকলে।

সেদিন একজন ঘনিষ্ঠ অসুস্থ রুগীকে দেখে হাসপাতাল থেকে আসতে আসতে রাস্তাতেই আজান হয়ে গেলো। বাড়ি পৌছাতে পৌছাতে মসজিদের নামাজ প্রায় শেষ। এই সময়টুকু আমি রিকশায় ছিলাম। চারপাশের নির্বিকার জনতা দেখতে দেখতে আসছিলাম। আজান হচ্ছে, কারো কোনো টেনশন নেই। দোকানদার নির্বিকার চিত্তে বিক্রি করছে। খরিদ্দাররা কেনাকাটা করছে। পথচারীরা

www.pathagar.com

নির্ভাবনায় পথ চলছে। রিকশা একটা মসজিদের পাশ দিয়ে যেতেই দেখলাম মাগরিবের নামাজ দাঁড়িয়ে গেছে স্বল্প কয়েকজন মুসল্লি নিয়ে। ৯৯% মুসলমান নির্বিকার চিত্তে তাদের দৈনন্দিক কাজ কর্মে ব্যস্ত। এই যে আজান হয়ে গেলো তা যেনো কেউ শুনতেই পায়নি। না, কেউ শুনতে পায়নি বললে ভুল হবে, কারণ আজান শুনে অনেকে তাদের দোকানে আগর বাতি জ্বালিয়েছে। আজানের হক যেনো আদায় হয়ে গেলো। শুধু মাগরিব নয়। এসব মুসলমানরা ফজরও ঘুমিয়েই পার করে। যোহর, আসরে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। এশার নামাজের তো প্রশ্নই আসে না। সারাদিনের ব্যস্ততায় দেহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। জুমার দিন অবশ্য অনেকেই সেজে গুজে মসজিদে আসে। অনেকে আবার মাঝে মধ্যে দু'চার ওয়াক্ত পড়েও।

এদের নাম, আবদুর রহিম, আবদুর রাজ্জাক, হাসিনা, আমেনা, হাজেরা...। এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। অথচ এরা জানে না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিষ্ঠার সাথে আদায় না করলে মুসলমানদের খাতায় নাম থাকে না। রাসূল (সা:) বলেছেন, "ঈমানদার এবং বে-ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরজ করা হয়েছে। অতএব নামাজ ত্যাগকারী তো মুসলমানের অন্তর্ভুক্তই না। হযরত ওমর (রা:) বলেন, "নামাজ ত্যাগকারী ইসলাম প্রদত্ত কোনো সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে না।" (কবীরা গুনাহ- পৃষ্ঠা ২৩)

নামাজে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "সেসব নামাজির জন্য ওয়াইল (আযাবের কঠোরতা) যারা নামাজে অবহেলা করেছে।" (সূরা মাউন)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) বলেন, "আমি রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এই অবহেলা মানে কি?"

তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা। মহান আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন: ৯)

এই আয়াতে আল্লাহর স্মরণ বলতে নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা:) বলেছেন, "হাশরের দিন প্রথমেই বান্দার আমরসমূহের মধ্যে নামাজের হিসাব

www.pathagar.com

নেয়া হবে। যে নামাজের হিসাব সঠিকভাবে দিতে পারলে সে পরিত্রাণ পাবে, নচেৎ ব্যর্থতা অবধারিত।" (তাবারানী)

রাসূল (সা:) আরো বলেন, "যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল সে আল্লাহর যিম্মাদারী থেকে বের হয়ে পড়ল।" (বুখারী, মুসলিম)

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করবে বিচার দিবসে তা তার জন্য নূর হবে এবং মুক্তির উপায় হবে। আর যে ঠিকমতো নামায় আদায় করবে না, তার জন্য নামাজ নূর ও নাজাতের অসিলা হবে না। হাশরের দিন ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে। (আহমাদ, তাবরানী)

এক লোক রাসূল (সা:)-এর নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইসলামের কোন কাজ আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়? তিনি বললেন, সময় মতো নামাজ আদায় করা। যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করল তার কোন দীন নেই। নামাজ ইসলামের স্তম্ভ। (বায়হাকী)

রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ঠিক মতো আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি পুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

১. তার অভাব দূর করবেন;
২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন;
৩. ডান হাতে আমলনামা দেবেন;
৪. বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার করবেন; ও
৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আর যে ব্যক্তি নামাজে অবহেলা করবে আল্লাহ তাকে চৌদ্দটি শাস্তি দেবেন। দুনিয়াতে পাঁচটি, মৃত্যুর সময় তিনটি, কবরে তিনটি, কবর থেকে উঠানোর সময় তিনটি।

দুনিয়াতে পাঁচটি

১. তার হায়াত থেকে বরকত কমে যাবে।
২. চেহারা থেকে নেককারের নিদর্শন লোপ পাবে।
৩. তার কোনো নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবে না।
৪. তার কোন দু'আ কবুল হবে না।
৫. নেককারের দু'আ থেকে সে বঞ্চিত হবে।

www.pathagar.com

মৃত্যুর সময় তিনটি

১. সে অপমানিত হয়ে মারা যাবে।

২. অনাহারে মারা যাবে।

৩. এমন পিপাসার্ত হয়ে মারা যাবে যে, তাকে পৃথিবীর সব সমুদ্রের পানি পান করালেও তার পিপাসা যাবে না।

কবরে তিনটি

১. কবর সংকীর্ণ হয়ে এতো জোরে চাপ দেবে যে তার পাঁজরের এক দিকের হাড় অন্যদিকে ঢুকে যাবে।

২. কবরে আগুন ভর্তি করে রাখা হবে। আগুনের জ্বলন্ত কয়লায় সে রাতদিন জ্বলতে থাকবে।

৩. তার কবরে এমন ভয়ংকর বিষধর সাপ রাখা হবে, যা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

পুনরুত্থানের সময় তিনটি

১. কঠোরভাবে হিসাব নেয়া হবে।

২. আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

৩. তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর বর্ণনা আছে, বিচার দিবসে তার কপালে তিনটি কথা লেখা থাকবে–

১. হে আল্লাহ্ হক নষ্টকারী।

২. হে আল্লাহর অভিশপ্ত।

৩. হে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। (কবীরা গুনাহ্- ইমাম আয-যাহাবী)

নামাজে ধীর স্থিরতা ও একাগ্রতা

নিশ্চিত সফল হয়েছে সেসব মুমিন যারা তাদের নামাজে বিনয় ও একাগ্রতা অবলম্বন করে। (সূরা মুমিনুন: ১-২)

অর্থাৎ ধীর স্থির এবং বিনয় ও একাগ্রতা নিয়ে নামাজ পড়তে হবে, তাহলে সফলতা পাওয়া যাবে। আমাদের সমাজে একদল নামাজিদের নামাজের সময় খুবই তাড়াহুড়া করতে দেখা যায়। তারা রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই

www.pathagar.com

সিজদায় চলে যায়। এক সিজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসে না। একটু মাথা তুলেই আবার সিজদায় যায়। সে সিজদাও এত দ্রুত যে সিজদার দু'আ পড়ল কি পড়ল না, তা সন্দেহ হয়।

রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে বলে কাওমা, এক সিজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসার নাম জালসা। কাওমা এবং জালসা এ দুটোই ওয়াজিব। অনেকেরই এই ওয়াজিব আদায় হয় না। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসূল (সা:) সেখানে বসা ছিলেন। লোকটি নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে লোকটি রাসূল (সা:)কে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, আবার নামাজ পড়, কেননা তুমি নামাজ পড়নি।" সে ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম করল। রাসূল (সা:) আবার তাকে নামাজ পড়তে বললেন, এভাবে তিনবার নামাজ পড়ে লোকটি বিনীত স্বরে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, নামাজের এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আমার জানা নেই। আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, "যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা এবং তোমার সাধ্যানুযায়ী কুরআন পড়। তারপর রুকু কর এবং ধীর স্থিরভাবে রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর সিজদা কর এবং সিজদায় গিয়ে স্থির হও। এভাবে বাকি রাকআতগুলো সম্পন্ন কর। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজের রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামাজ তার জন্য যথেষ্ট নয়।" (মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ)

"মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় চুরি হল নামাজ চুরি। আরয করা হল, নামাজে কিভাবে চুরি করা হয়? তিনি বললেন, "ঠিক মতো রুকু, সিজদা না করা এবং সঠিকভাবে কিরাআত না পড়া।" (আহমাদ, হাকেম, তাবরানী)

"নামাজ জান্নাতের চাবি।" এই হাদিসটি পড়লেই একটা দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে উঠে। যারা নামাজ পড়ে না। তারা অনেকেই অনেক ভালো কাজ করে অথচ তার বিনিময়ে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। যেহেতু তারা নামাজ পড়েনি, অতএব তাদের তো চাবি নেই। অথচ তাদের জান্নাতের দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। জাহান্নামের প্রহরীরা এসে তাদের পাকড়াও করে নিয়ে যাবে। কি মর্মান্তিক হবে সেই সময়টা, তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না সেখানে। আর যারা দুনিয়ার জীবনে নামাজি ছিল, তারা নিশ্চিন্ত মনে যার যার চাবি নিয়ে তাদের নির্ধারিত জান্নাতের দরজা খুলে তাতে প্রবেশ করবে।

www.pathagar.com

আমাদের সমাজে একদল মুসলমান আছে, তারা মোটেও নামাজ পড়ে না। আর একদল আছে নিয়মিত পড়ে না। এ উভয় দলের জন্যই কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন পরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'আলা। আবার নিয়মিত নামাজিদেরও অনেকের রুকু, সিজদা, কাওমা, জালসা ঠিক মতো আদায় হয় না। কিরআত সহীহ হয় না। আবার অনেকের সহীহ সুদ্ধ হলেও নামাজে যা পড়ে তার অর্থ বুঝে না। অর্থ না বুঝলে নামাজে একাগ্রতা ও বিনয় বা খুশু খুজু কি করে আসবে? আর খুশু খুজু (বিনয় ও একাগ্রতা) ছাড়া নামাজ আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"

আসুন আমরা নামাজী হই

যেভাবে রাসূল (সা:) নামাজ শিখিয়েছেন, সাহাবারা যেভাবে নামাজ আদায় করেছেন সেভাবে নামাজ পড়ি।

আসুন প্রতিদিন মহান প্রভুর সাথে প্রাণ উজাড় করে কথা বলি। নামাজই তো মুমিনের মিরাজ। নিয়মিত সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ধন্য হই।

রাসূল (সা:)-এর যুগে চিহ্নিত মুনাফিকরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। কারণ মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে গেলে নামাজ যে পড়তেই হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের চেহারা ভিন্ন। নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, মুসলমানের মতো নাম রাখে অথচ নামাজ পড়ে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, "নামাজ অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা তাদের না দেখা রবকে ভয় করে।" (সূরা বাকারা)

অর্থাৎ যারা নামাজ পড়ে না তারা তাদের না দেখা রবকে ভয় করে না, মানে বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বাস করে না মানেই তো তাদের ঈমান নেই। তারা বে-ঈমান। এদের মধ্যে অনেকে আবার আস্ফালন করে বলে 'নামাজ না পড়লে কি হবে, ঈমান ঠিক আছে?"

এর চেয়ে হাস্যকর কৌতুক আর হয় না।

রাসূল (সা:) স্পষ্ট বলেছেন, "মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো- নামাজ।"

অর্থাৎ বে-নামাজী কোনো অবস্থাতেই ঈমানের দাবী করতে পারে না। অথচ আমাদের চার পার্শ্বের এসব বে-নামাজীরা আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। এদের

www.pathagar.com

পার্থিব বিপদ মুসিবতে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই। সাহায্য সহযোগিতা করি। বে-নামাজি' হওয়ার কারণে এরা যে কঠিন বিপদে নিক্ষিপ্ত হবে, সে বিষয়টা এদের বুঝানো আমাদের দায়িত্ব। বুঝানোর পরেও না বুঝলে তো আর আমাদের করার কিছু নেই, দু'আ করা ছাড়া।

মহান আল্লাহ তাঁর এসব বান্দাদের নামাজ পড়ার তাওফীক দান করুন। ইবলিসের সকল প্রকার ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমাদের নামাজসমূহ কবুল করে নিন। আমিন॥

মিরাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

মিরাজ রাসূল (সা:) এর জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আশ্চর্য ঘটনা। যে ঘটনায় প্রকাশ এই রাতে রাসূল (সা:) বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস হয়ে সপ্ত আসমান যমীন পার হয়ে সিদরাতুল মোনতাহা পার হয়ে মহান আল্লাহ পাকের আরশ মোয়াল্লায় পৌঁছে যান। সেখানে তাকে দেখানো হয় আল্লাহ পাকের অসংখ্য অজানা এবং অলৌকিক নিদর্শন। জান্নাত জাহান্নামের নকশা। হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত এবং ইসলামী সমাজ গঠনের মূলনীতি। সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অনুবাদ (২৮৫) রাসূল সেই হেদায়াত (পথ নির্দেশ) কেই বিশ্বাস করিয়াছেন যাহা তাহার পরোয়ারদেগারের নিকট হইতে তাহার প্রতি নাযিল হইয়াছে। আর যাহারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে তাহারাও সেই হেদায়াতকে মন দিয়া মানিয়া লাইয়াছে। ইহারা সকলেই আল্লাহ, ফিরিশতা, তাঁহার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাহাদের কথা এই: আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনিয়াছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মানিয়া লইয়াছি। হে আল্লাহ! আপনার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদিগকে আপনার দিকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। (২৮৬) আল্লাহ কোন প্রাণীর উপরই তাহার শক্তি সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব বোঝা চাপাইয়া দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূন্য অর্জন করিয়াছে তাহার প্রতিফল তাহারই জন্য। আর যাহা কিছু পাপ সঞ্চয় করিয়াছে তাহার খারাপ ফল তাহার উপরই পড়িবে। (তোমরা এইভাবে দোয়া কর) হে আমাদের রব ভুল ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যাহা কিছু ক্রটি হয় তাহার জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিও না। হে রব আমাদের উপর সেই ধরনের বোঝা

www.pathagar.com

চাপাইয়া দিও না যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলে। হে রব! যে বোঝা বহন করার শক্তি, ক্ষমতা আমাদের নাই তাহা আমাদের উপর চাপাইও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর। তুমিই আমাদের মওলা আশ্রয়দাতা, কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য দান কর।"

ইসলামী সমাজ গঠনের মূলনীতিই হল- মিরাজ রজনীর প্রধানতম শিক্ষা। ইসলাম কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে ইসলাম। আল্লাহ্পাক সকল জীবন ব্যবস্থার উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

তাই তৌহিদি জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে মানুষের সঠিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পত্তন ও প্রবর্তনই ছিল রাসূল (সা:) এর মূল কাজ এবং সেই কাজটি যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় রাসূলকে মিরাজ রজনীতে বিভিন্ন জ্ঞান দানের সাথে ১৪ট মূলনীতি তুলে দিলেন। এই মূলনীতি অনুযায়ীই তিনি পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত করলেন মুসলিম সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যা সূরা বনী ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ্ পাক ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধারাগুলি (১৪টি) হচ্ছে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামো। এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে যদি কোন সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে সে সমাজে অশান্তি প্রবেশের কোন পথই থাকতে পারে না।

সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ১৪টি নীতি

"তোমাদের প্রভু সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে-

১. তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব আনুগত্য ও উপাসনা করবে না।

২. আর পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুইজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন তবে তাদের সাথে উহ্! শব্দটা পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছজ্ঞান করে ধমক দিয়া কথা বলবে না। তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে। তাদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনয় বিনম্রভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে আর বলবে, 'হে প্রভু তাদেরকে সেইরূপ

প্রতিপালন করুন যে রূপে তারা আমাদেরকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছিলেন। তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও তবে মনে রেখ আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

৩. আপন আত্মিয়-স্বজনের হক বুঝিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মোসাফিরদের হক বুঝিয়া দাও। আর অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করো না।

৪. যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার প্রভুর অকৃতজ্ঞ।

৫. তুমি যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্থ, আত্মীয় স্বজন মিসকিন ও সম্বলহীন পথিক) থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে তুমি তোমার রবের যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী তা এখনও তালাশ করছ তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও।

৬. নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখনা কিংবা একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না। তা করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য তা রিজিক প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য চান রিজিক সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সব জানেন এবং তাদের দেখছেন।

৭. নিজেদের সন্তানকে দরিদ্রতার আশংকায় হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযক দিব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতঃ তাদের হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ।

৮. যেনার নিকটও যাবে না। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।

৯. প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না। যাকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যতা সহকারে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অভিভাবকে আমরা কেসাস দাবী করার অধিকার দিয়েছি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে।

১০. ইয়াতিমের ধন মালের কাছেও যাবে না। তবে উত্তম পন্থায়, যতদিন না সে যৌবন লাভ করে।

১১. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

১২. পাত্রদিয়ে মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওজন করে দেবে। এটা খুবই ভাল নীতি। আর পরিণামের দৃষ্টিতেও ইহা অতীব উত্তম।

১৩. এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগে যেওনা যে জিনিসের কোন জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চিত জেনে নাও, চক্ষু, কান ও দিল সবকিছুকেই জওয়াবদিহি করতে হবে।

১৪. যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে দীর্ণ করতে পারবে আর না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে।"

এই হল মিরাজের শিক্ষা। এই শিক্ষাকে অবহেলা করে মিরাজের অন্যান্য মনগড়া অনুষ্ঠানাদি করা আত্ম প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে শুধু এই নিয়ম নীতি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। এই নিয়ম নীতি অস্বীকার কারীর নির্মম, নিদারুণ পরিণতি আর মান্যকারীদের অফুরান অপার্থিব সফলতা সচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। রাসূল (সা:) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলেন এবং কেন? কি কারণে? কোন কাজের কি ফল তাও জানালেন। আর শুনলেন দোজখ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ, "ইয়া রাব্বী আতিন, বিমা ওয়াত্তানী।" "হে আল্লাহ! যাদেরকে আমার মধ্যে দেওয়ার ওয়াদা করেছে তাদেরকে আমার মধ্যে দাও।"

দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে, মিরাজ রজনীর সঠিক গুরুত্ব ও মূল্য দিতে চাইলে সর্বোপরি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে মিরাজ রজনীতে আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় হাবিবকে প্রিয় নবীকে যে শিক্ষা, যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, বিনা তর্কে, নিঃশংকচিত্তে 'সামিয়ানা ওয়া আতা'না' আমি শুনলাম এবং মেনে নিলাম বলে পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে।

এ রাত নফল এবাদতের রাত নয়। এ দিনে রোজা রাখা কিংবা রাত জেগে নামাজ পড়ার কোন নির্দেশ কিংবা নিয়ম রাসূল (সা:) প্রবর্তন করেন নি। আসল শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করে এই রাতে কতিপয় মনগড়া ইবাদতে মশগুল থাকে মুসলিম জাতি। সনদ বিহীন ফজিলতের কথা বর্ণনা করা সওয়াবের কাজ নয়। রসম ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মূল শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে শরীয়তের গৌরব বৃদ্ধি পায় না। সত্যিকার দ্বীনদার হওয়া যায় না।

www.pathagar.com

এই রাত হবে প্রতিজ্ঞার রাত। ভুলে যাওয়া শিক্ষা ঝালাই করার রাত। তাই আমার মতে এ রাতে আমাদের বেশী করে কোরান থেকে আলোচনা করা এবং শোনা উচিত। বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাইলের শিক্ষাগুলো যা এ রাতে আল্লাহ পাক নাযিল করেছিলেন। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সঠিক কথা বোঝার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

মহিলা সাহাবীদের ত্যাগ

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকল নবী-রাসূল (আ)-কেই করতে হয়েছে প্রাণান্তকর পরিশ্রম। সইতে হয়েছে নিদারুণ কষ্ট-ক্লেষ্ট। ভোগ করতে হয়েছে নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন। তারপরও তারা থেমে যান নি। তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায় নি। সমাজের ধনী এবং নেতৃস্থানীয় কেউ বুঝে কেউ না বুঝে বিরোধিতা করেছে। এ একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সময়ও। এ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রাসূল (সা:) এক দল জীবনবাজি রাখা কর্মী পেলেন। যারা নবীজীর কাজকে বেগবান করলেন। তাঁদের ওপর নেমে এল অত্যাচারের স্টীম রোলার। ইবলিসের দোসররা কত অত্যাচার আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার প্রমাণ দিল তারা, কিন্তু আল্লাহর বান্দারা শিশাঢালা প্রাচীরের মতো অনড়-অটল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভাষায়, 'বুনিয়ানুম মারসুস।' এ বুনিয়ানুম মারসুসের মধ্যে শুধু পুরুষই ছিলেন না, নারীরাও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস পড়লেই জানা যাবে, দীন কায়েমের সংগ্রামে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না।

এ কথা সবাই জানে, রাসূল (সা:) যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, সেই দাওয়াতে প্রথম সাড়া দিয়েছেন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা:)। শুধু সাড়া দেননি, বরং তাঁর ধন-সম্পদও ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন। খাদীজা (রা:) ধনাঢ্য মহিলা, বিপুল সম্পদের অধিকারিনী। সে সময়ে তাঁর ব্যবসা একদিকে সিরিয়া অন্যদিকে ইয়ামেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তার বিপুলসংখ্যক কর্মচারী ছিল। শুধু তাই নয়,খাদীজা (রা:) ছিলেন তৎকালীন ব্যাংক সমতুল্য। শত শত মানুষ তাঁর থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত।

মহীয়সী খাদীজা (রা:) তাঁর সমুদয় সম্পত্তি রাসূল (সা:) সমীপে উজাড় করে দিয়েছিলেন। সে দুর্যোগপূর্ণ দিনে খাদীজা (রা:) ইসলামের জন্য সব সম্পত্তি

www.pathagar.com

দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং প্রতিটি বিপদাপদে নবীজীকে সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। খাদীজা (রা:) সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা:) বলতেন, 'আমি যখন কাফিরদের নিকট থেকে কোনো কথা শুনতাম, যা আমার নিকট অসহনীয় মনে হতো, তখন আমি তা খাদীজা (রা:)কে বলতাম। সে আমাকে এমনভাবে সাহস জোগাত যে, আমার অন্তর শান্ত হয়ে যেত। আমার এমন কোনো দুঃখ ছিল না, যা খাদীজা (রা:)-এর মাধ্যমে অবসান এবং হালকা হতো না।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একবার রাসূল (সা:) হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) এলেন। তিনি বললেন, খাদীজা আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছে। তাঁকে মহান রাব্বুল আলামীন সালাম দিয়েছেন এবং আমার সালামও তাঁকে পৌছে দেবেন।' কল্পনা করা যায়? আল্লাহর দীনের প্রতি কতখানি নিবেদিতপ্রাণ হলে, কতটা প্রিয় পাত্রী হলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সালাম পাঠান।

রাসূল (সা:)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে, কুরাইশদের নিকট কালেমা তাইয়েবার দাওয়াত পৌছানোর আগ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশরা তাঁকে আল আমীন, আস সাদিক- কত নামেই না সাদর সম্ভাষণ করেছে। কিন্তু যখনই তিনি নবুওয়াত পেলেন, হকের দাওয়াত পেশ করতে লাগলেন, তখনই তারা নবীজীর খুনপিপাসু হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, যারাই সত্য দীনের প্রতি সাড়া দিতেন তাদের ওপর নেমে আসত যুলুম-নির্যাতন। তাতে পুরুষ ও মহিলার কোনো পার্থক্য ছিল না। সেই যুগে প্রিয় নবী (সা:) বনু মাখযুমের মহল্লা দিয়ে একদিন অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন কুরাইশ কাফিররা একজন বার্ধক্যপীড়িত মহিলাকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে রৌদ্রে বালিতে শুইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলছে, 'মুহাম্মদের দীন কবুল করার স্বাদ কী তা বুঝে নে।' নির্মম নির্যাতনের শিকার অসহায় এ বৃদ্ধাকে দেখে নবীজীর বুক ভেঙ্গে গেল। তিনি অশ্রুসজল হয়ে বললেন, ধৈর্য ধর। তোমার ঠিকানা জান্নাত।

এ নির্যাতিত মহীয়সী মহিলার নাম হযরত সুমাইয়া বিনতে খাবাত (রা:)। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান মহিলা সাহাবী ছিলেন। সাইয়্যিদুল মুরসালীন (সা:) তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও জন্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নিজের বার্ধক্য এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি হক পথে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মহিলা শহীদ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

www.pathagar.com

খাতুনে উহুদ বা উহুদ কন্যা উম্মে আম্মারা (রা:)-এর কথা বলা যায়। প্রথমে বায়আতে আকাবার পর উম্মে আম্মারা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের ১৩ তম বছরে তিনি সেই ৭২ জনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যারা আকাবাতে প্রিয় নবী (সা:)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল (সা:) ইয়াসরিবে এলে তাঁকে জানমাল ও সন্তানসহ সমর্থন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হিজরতের তৃতীয় বছর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উম্মে আম্মারা (রা:) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এমন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, রাসূল (সা:) তাঁকে খাতুনে উহুদ উপাধিতে ভূষিত করেন।

যুদ্ধশেষে উম্মে আম্মারা (রা:)-এর ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। হুজুর (সা:) তাঁর ক্ষতস্থানে স্বয়ং পট্টি বাঁধেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আজ উম্মে আম্মারা (রা:) তাদের সবার চেয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছেন।'

উম্মে আম্মারা তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার জন্য দু'আ করুন, যেন জান্নাতেও আপনার সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়।

হুযুর (সা:) বললেন, 'উহুদের দিন ডান-বামে যেদিকেই নজর দিতাম, শুধু উম্মে আম্মারাই লড়াই করতে দেখতাম। উহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারা (রা:)-এর দেহে ১২টি আঘাত লেগেছিল।

রাসূল (সা:)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা:)-এর খিলাফতকালে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা:)-কে ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কায্যাবকে উৎখাত করার জন্য নিয়োগ করা হয়। তখন উম্মে আম্মারাও এ বাহিনীতে যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তিনি তরবারি ও বর্শার ১১টি আঘাত পান। একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু জান-মালই নয়, স্বামী-সন্তানও কুরবানী করেছেন তিনি ইসলামের জন্য।

উম্মে সুলাইম (রা:)

বলিষ্ঠ ঈমানের অলংকারে সজ্জিতা সুদীপ্তা এক নারী উম্মে সুলাইম। নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবন সাথী মালিক বিন

www.pathagar.com

নজর কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করল না। মালিক বিন নজরের সাথে উম্মে সুলাইমের দাম্পত্য জীবন এতো মধুর ছিল যা সেই জামানায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উম্মে সুলাইম জীবন সাথীকে জীবন দিয়েই ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর ঈমান ছিল এত সুদৃঢ় যে, জীবন সাথীর প্রেম, দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ কিছুতেই তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি শিশুপুত্র আনাস (রা:)কে ধীরে ধীরে ইসলামের পাক কালিম শিক্ষা দিতে থাকেন। জীবন সাথী মালিক বিন নজর এতে ভীষণ রেগে যান। চাপ দিয়ে ইসলাম থেকে সরানোর চেষ্টা করে। শেষে রাগ করে নিজেই সরে যায় উম্মে সুলাইমের জীবন থেকে। উম্মে সুলাইম জীবন সাথীকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু ইসলামের চেয়ে বেশি নয়। তাই তিনি ধৈর্যের সাথে এই বিপদের মোকাবেলা করেন। পুত্র আনাস (রা:) এর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি একদিন পুত্রের হাত ধরে রসূল সা.-এর কাছে আসেন এবং পুত্রকে রাসূল সা. এর খেদমতে পেশ করেন। এর কিছুদিন পরেই আবু তালহা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবু তালহা তখনও ইসলাম কবুল করেননি। উম্মে সুলাইম শিরকের কারণে প্রথম স্বামীর প্রেমময় সম্পর্কের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেছেন। এখন তিনি অন্য একজন মুশরিককে কি করে বিয়ে করতে পারেন? তাই বিনয়ের সাথে তিনি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। কিছুদিন পর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পুত্র আনাসের বয়স তখন ষোল বছর। উম্মে সুলাইম আবু তালহার ইসলাম গ্রহণে এতো খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, 'আবু তালহার সাথে আমার বিয়ের মোহর হবে ইসলাম।' হযরত সাবিত (রা:) বলতেন, 'আমি কোন মহিলার মোহর উম্মে সুলাইমের থেকে উত্তম ছিল বলে শুনিনি। আবু তালহা উম্মে সুলাইমের দাওয়াতেই ঈমান আনেন। যখন আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন উম্মে সুলাইম আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি তো মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। অবশ্য তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা পাথরের বা কাঠের মূর্তির পূজা করো, যা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না। এইকথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, যাতে ইসলামের সত্যতা আবু তালহার কাছে প্রতিভাত হয় এবং কয়েকদিন চিন্তা করার পর তিনি মুসলমান হন। আবু তালহা ছিলেন খুবই মামুলী ধরনের লোক। উম্মে সুলাইমের দাওয়াতে, উম্মে সুলাইমের

www.pathagar.com

সংস্পর্শে তিনি হন হযরত আবু তালহা রা. আশারায়ে মুবাশ্বারাদের একজন। অন্যান্য মুসলিম নারীদের মতো উম্মে সুলাইমও পুরুষদের পাশাপাশি অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সা.-ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এবার এক নাম না জানা বেদুইন কন্যা সাহাবীর কথা বলি। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ ছিলেন না, ছিলেন যাযাবর কন্যা। ফেরি করে প্রসাধনী বিক্রি করতেন। যার কারণে সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের বাড়ির অভ্যন্তরেও তিনি যেতে পারতেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসাধনী ও সুগন্ধী বিক্রি করতেন। সাথে সাথে মহিলাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর এভাবেই কুরাইশদের গৃহাভ্যন্তরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। তাঁর দাওয়াতে কিছু কুরাইশ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিষয়টি কুরাইশ সরদারদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়। একদিন কুরাইশের পাষণ্ড নেতারা তাঁর সকল পণ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয় এবং তাঁকে একটি উটের সাথে বেঁধে মরুভূমির দিকে ছেড়ে দেয়। উটটি মরুভূমির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। তিনি বলেন, আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবুও চিৎকার করে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছিলাম। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করান। মদীনাগামী একটি কাফেলা আমাকে নিয়ে ছোটা উটটিকে ধরে ফেলে এবং আমাকে উদ্ধার করে।

ইতিহাস গ্রন্থগুলো খুললে দেখা যাবে, শত শত নারীর আত্মত্যাগে ভরপুর ইতিহাসের পাতা। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়ার কষ্ট, দুঃখ-বিপদ-মসিবত, নির্যাতন-নিপীড়ন, আর্থিক দৈন্যতা- এগুলো তাঁদের মোটেও বিচলিত করত না। আবু দারদা (রা:) ঘরবাড়ি বাগানসহ সবকিছু দীনের জন্য রাসূল (সা:)-এর কাছে সঁপে দিয়ে এসে স্ত্রীকে বললেন, উম্মে দারদা, ঘর থেকে বের হয়ে এস। এ ঘরবাড়ি, বাগান আমি ইসলামের জন্য দান করে দিয়েছি। উম্মে দারদা বলতে পারতেন, একি সর্বনাশ তুমি করেছ? আমরা কোথায় যাব? কিন্তু না, তিনি খুশি মনে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন আর বললেন, 'আবূ দারদা, তুমি উত্তম সওদা করেছ।' এ জন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরে বন্ধু ও সাহায্যকারী... ।' (সূরা তওবা)

সে সমাজে বিপরীতধর্মী কিছু নারীও ছিল। যেমন- রাসূলের চলার পথে কাঁটা ছিটানো বুড়ি উম্মে জামিল, হিন্দা। তবে এরা ছিল সংখ্যায় কম। আল্লাহর জন্য,

www.pathagar.com

তাঁর রাসূল-এর জন্য, ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী নারীর সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে ব্যাপারটা যে উল্টে গেছে। বর্তমান বিশ্বে নারীরাই যেন ইসলামের বিরোধিতা বেশি করছে। মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলাম বিরোধিতায় তারা অমুসলিমদেরও হার মানায়। সবচেয়ে বড় কথা, সে যুগের বিরোধীরা সব কাফির অমুসলিম ছিল। ইসলামের গণ্ডির মধ্যে একবার প্রবেশ করলে সে ইসলামের জন্য জীবন দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র পিছপা হতো না, কিন্তু আফসোস, এখনকার বিরোধীরা সবই মুসলিম নামে পরিচিত।

মহিলা সাহাবীদের ইতিহাসচর্চা আমাদের সমাজে অনেক কমে গেছে। যে জাতি নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানে না, সে জাতি কী করে নিজের পরিচয় জানবে?

আমাদের সমাজের একদল মুসলমানের ধারণা মুসলিম নারী মানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। না, মুসলিম নারী কোনো অথর্ব প্রাণীর নাম নয়; আবার হাস্যে-লাস্যে, নাচে-গানে পরপুরুষকে তৃপ্তিদানে অভ্যস্ত কোনো বেহায়াও নয়। মুসলিম নারী হবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহস ও বীরত্বে, প্রেম ভালোবাসায়, ত্যাগ ও কুরবানীতে ভাস্বর। তৃপ্তি ও দীপ্তিদানকারী উজ্জ্বল নক্ষত্র, ওপরে বর্ণিত সাহাবীদের মতো।

আমাদের শিশুদের দশ জন খেলোয়াড়ের নাম, ২০ জন নায়কের নাম, ৩০ জন নায়িকার নাম, গায়িকার নাম জিজ্ঞেস করুন, তারা ঝটপট উত্তর দিতে পারবে, কিন্তু দশজন সাহাবীর নাম জিজ্ঞেস করে দেখুন, কোনো মতে চার জন খলীফার কথা হয়তো বলতে পারে। এরপর আর পারবে না, আর মহিলা সাহাবীদের নামের তো প্রশ্নই উঠে না। এর জন্য দায়ী তো আমরাই।

ইবলিসের দোসররা ইসলাম বিরোধিতার জন্য নারীদেরই অধিক পরিমাণে রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে, দোকানে-বাজারে, শিক্ষাঙ্গনে নিয়োজিত করছে। আর তাইতো মহিলারা হাদীসের কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান করলে চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করছে, মেয়েদের জন্য এসব কি জায়েয?” প্রহসন আর কাকে বলে?

আমি আল্লাহর সকল বান্দীদের আহ্বান করছি, আসুন আমরা অধিক পরিমাণে মহিলা সাহাবীর ত্যাগ-তিতিক্ষা, দীনের জন্য তাঁদের ভালোবাসা, কুরবানীর আলোচনা বেশি বেশি করি।

www.pathagar.com

নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের তাঁদের মতো করে যেন গড়ে তুলতে পারি, সেই চেষ্টা এবং প্রার্থনা অব্যাহত রাখি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মহিলা সাহাবীর মতো আদর্শ নারী হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন॥

বুদ্ধিমতী নারী সাফনা বিনতে হাতিম

হাতিম তাঈ'র নাম শুনে নি এমন লোক আছে বলে আমার মনে হয় না। হাতিম তাঈকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী, অনেক রূপকথা তৈরি হয়েছে। অথচ হাতিম তাঈ কোনো রূপকথার নায়ক ছিলেন না। আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম তাঈ ইয়ামেনের তাঈ গোত্রের সর্দার ছিলেন। তিনি নিজের গোত্রসহ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয়নবী (সা:)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর কন্যা হযরত সাফনাহ (রা:) বাবার মতোই বাহাদুর এবং দানশীলা নারী। ইয়ামেনের লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে আসছিল। নবম হিজরী সনে রাসূল (সা:) হযরত আলী (রা:)-এর নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী বনু তাঈ'তে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর আক্রমণের কথা শুনে তাঈ গোত্রের তৎকালীন সর্দার আদী ইবনে হাতিম পরিবার-পরিজন নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জোশিয়া নামক পল্লীতে বসবাস শুরু করেন। আদী ইবনে হাতিম যাওয়ার সময় তাঁর ছোট বোনকে সাথে নিতে ভুলে যান। বোন সাফনাহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন।

সাফনাহ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বুদ্ধিমতী। তিনি মোটেও ভীত হলেন না। কান্নাকাটি করলেন না। রাসূল (সা:) যখন বন্দীদের দেখতে এলেন, তখন সাফনাহ এগিয়ে গিয়ে আদবের সাথে বললেন, হে কুরাইশ সর্দার, আমি বন্ধু-বান্ধব সহায়হীন। আমার ওপর রহম করুন। পিতার স্নেহের ছায়া আমার ওপর থেকে উঠে গেছে। আমি আমার পিতার বড় আদরের দুলালী ছিলাম। আমাকে একা ফেলে আমার ভাই পালিয়ে গেছে। আমার পিতা বনু তাঈয়ের সর্দার ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তকে আহার করাতেন, ইয়াতীমদের অভিভাবকত্ব নিতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করতেন, মযলুমদের সাহায্য করতেন। যুলুমের মূল উৎপাটন করতেন। কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেন না। আমি সেই হাতিম তাঈয়ের কন্যা। আমি কোনো দিন কোনো মানুষের কাছে অনুগ্রহ চাইনি। আপনি ভালো মনে করলে আমাকে আযাদ করে দিতে পারেন। আমাকে যিনি মুক্ত করবেন তিনি নেই। এ জন্য আপনি নিজেই আমার ওপর রহম করুন। আল্লাহ্ আপনার ওপর ইহসান করবেন।

www.pathagar.com

রাসূল (সা:) সাফনার কথা শুনে বললেন, 'হে নারী, তোমার পিতার যে গুণাবলী তুমি বর্ণনা করেছ, তা তো মুসলমানদের গুণাবলি। যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে আমরা তার সাথে ভালো আচরণ করতাম।'

এরপর তিনি সাহাবীদের (রা:) নির্দেশ দিলেন, 'এ মহিলাকে আযাদ করে দাও। সে একজন সম্ভ্রান্ত এবং উত্তম চরিত্রের পিতার সন্তান। কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষ অপমানিত হলে, কোনো বিত্তবান ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি ইহসান কর।'

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) তৎক্ষণাৎ সাফনাকে বন্ধনমুক্ত করে দেন। কিন্তু তিনি একই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূল (সা:) বললেন, আরো কিছু বলবে?

সাফনাহ আবেগের সাথে আরয করলেন, 'হে দয়ালু ব্যক্তি, আমি যে পিতার কন্যা তিনি কাওমকে মুসিবতে রেখে নিজে সুখের নিদ্রা যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। আমি তার মেয়ে হয়ে কী করে কাওমকে ফেলে যেতে পারি? আপনি আমার ওপর দয়া করেছেন, আমার কাওমের ওপরও দয়া করুন। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।'

রাসূল (সা:) সাফনার কথা শুনে খুব প্রভাবিত হয়ে তাঈ গোত্রের সকল কয়েদিকে মুক্ত করে দেন। সাফনাহ জানতেন, তার ভাই জোশিয়ায় আছেন। ভাই আদী ইবনে হাতিম তাড়াহুড়ার মাধ্যমে বোনকে ফেলে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এরপর অত্যন্ত মনোকষ্টের মধ্যে দিনাদিপাত করছিলেন। বোন মুসলমানদের হাতে বন্দি- এ কথা ভাবতেই হতাশায় তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

ভাইবোনের সাক্ষাৎ কীভাবে হলো তা আদীর ভাষাতে এরূপ- 'জোশিয়ায় একদিন আমাদের গৃহের সামনে একটি উট এসে থামল। হাওদার ওপর একজন নেকাব আবৃত মহিলা বসে ছিলেন। আমার বোন মনে হয়, কিন্তু তা কী করে হয়? তাকে তো মুসলমানরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। সে এরকম জাঁকজমকের সাথে কীভাবে আসতে পারে? ঠিক সে সময় হাওদার পর্দা উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে এল, 'যালিম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, তোমার উপর থুথু নিক্ষেপ করি। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছে, আর পিতার মেয়েকে শত্রুর হাতে ছেড়ে এসেছ। তাঈ বংশের কলঙ্ক তুমি।' সহোদরার কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার করলাম, ক্ষমা চাইলাম। বোনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে অতি আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আরাম-বিশ্রামের পর আমি সাফনাহকে বললাম, বোন, তুমি তো খুব হুঁশিয়ার আর বুদ্ধিমতী, তুমি কুরাইশ নেতার সাথে মোলাকাত করেছ, এখন তুমিই সিদ্ধান্ত দাও। বোন জবাব

www.pathagar.com

দিল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর। যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অগ্রগামী হওয়া মর্যাদা ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি বাদশাহও হন তাহলেও ইয়ামেনের কেউই তাঁর কিছু করতে পারবে না এবং আগুয়ান হয়ে সাক্ষাৎ করাতে তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সাফনাহ'র পরামর্শ অনুযায়ী আদী ইবনে হাতিম তাঈ মদীনা পৌঁছে রাসূল (সা:)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সাফনাহ তো আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেমন সৌভাগ্যবতী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি মহিলা, যার উসিলায় গোটা তাঈ গোত্র এবং আদী ইবনে হাতিমের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেলেন।

সূত্র: মহিলা সাহাবী: তালিবুল হাশেমী

রাসূল (সা:) এর আনুগত্যে নারী

মহানবী এর সাহাবাদের মধ্যে আত্মোৎসর্গকারী পুরুষ যেমন ছিলেন তেমনি নিবেদিত প্রাণ নারীও ছিলেন। ইসলামের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ত্যাগ তিতিক্ষা প্রেম, আনুগত্য কোনো অংশে কম ছিলোনা। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে নারীদেরই ইসলামের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। রাসূল (সা:)কে ভালোবাসার ক্ষেত্রে, তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে নারীরা কখনও পিছিয়ে ছিলেন না।

সুন্নত শব্দের অর্থ পথ, বা নিয়ম নীতি। সুন্নাতে রাসূল (সা:) অর্থ রাসূল (সা:) এর প্রদর্শিত নিয়মনীতি বা পথ। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যা কিছু আদেশ নিষেধ হুকুম আহকাম রাসূল (সা:) এর কাছে এসেছে আমাদের কাছে সবই তো তা সুন্নাতে রাসূল (সা:)। তাই তো হযরত আয়েশা (রা:) এর কাছে রাসূল (সা:) এর চরিত্র কেমন ছিল তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন 'আল কুরআনই ছিল রাসূল (সা:) এর চরিত্র'।

অতএব সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ মানেই আল কুরআনের অনুসরণ। বর্তমানে যেমন ইসলামের বিধানকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মোস্তাহাব ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রাসূল (সা:) এর যুগে ইবাদাতের এতো ভাল ছিলো না। রাসূল (সা:) এর সাহাবাগণ রাসূল (সা:) কে যে ভাবে যে কাজ করতে দেখেছেন, আল কুরআনে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

www.pathagar.com

সেইভাবেই সেই কাজ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার ভাষায়: "ওয়া ক্বালু সামিয়ানা ওয়া আত্বয়না।" অর্থাৎ 'তারা বলে আমরা শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি।"

এমনিভাবে আনুগত্যের শির নত করেছেন পুরুষেরা এবং নারীরাও।

আল্লাহ পাক সূরা তওবার ৭১-৭২ নং আয়াতে এদের কথাই বলেছেন। "মুমীন পুরুষ এবং মুমীন নারী এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভালো কাজের আদেশ করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই।"

যে মোহাম্মদ (সা:)কে মক্কার লোকেরা উপাধি দিয়েছিলো আল-আমীন, আস-সাদিক-মক্কার সেই লোকেরাই তার জানের শত্রু হয়ে গেলো যখন তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তখন তাঁকে নবী হিসাবে, রাসূল হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি দেন একজন নারী, সেই মহিয়সী নারী তাঁর বিপুল ধনসম্পদ বিলিয়ে দেন এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে। সেই নারীর নাম খাদিজাতুল কুবরা।

এই দ্বীনকে গ্রহণ করার অপরাধে (?) প্রথম জীবন দেন তিনিও একজন নারী। তার নাম হযরত সুমাইয়া (রা:)। বর্তমান সমাজের মতো ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা বেপর্দা খোলামেলা যত্রতত্র যাতায়াত করতো। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম নারীরা নিজেকে হিযাবে আবৃত করে ফেলেন। তখনকার নিয়ম ছিল আল্লাহর তরফ থেকে যে কোনো নির্দেশ নাযিল হলে রাসূল (সা:) একজন ঘোষককে দিয়ে তা মদীনায় ঘোষণা করে দিতেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর ঘোষক যখন ঘোষণা করলেন 'সকল মুমীনা নারীকে পোশাকের উপর বড় চাদর পরে দৈহিক কাঠামো এবং রূপ সৌন্দর্য ঢেকে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। তখন এক মুমীনা নারী যিনি একটি বিশেষ কাজে বাড়ি থেকে দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে দিয়েছিলেন। সেখানে থেকেই তিনি এই নির্দেশ শুনলেন। তার কাছে তখন কোনো বাড়তি কাপড় ছিলোনা তাই সারাদিন তিনি সেখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। দিন শেষে রাতের আঁধারে বাড়ি আসেন। এমনি ছিল তাদের আনুগত্য। রাসূল (সা:) এর নির্দেশের একটুও বাইরে তারা যেতেন না। রাসূল (সা:)কে তারা ভালোবাসতেন জীবনের চেয়ে বেশী। ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম নারীরা যেভাবে

www.pathagar.com

রাসূল (সা:)কে নিরাপদ রাখার জন্য নিজেদের দেহকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের আর কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন যুদ্ধ জিহাদের সময় রাসূল (সা:) মেয়েদের কাছে অর্থ সহযোগিতা চাইতেন। তখন আল্লাহর দান রাসূল প্রেমিক নারীরা নগদ টাকা পয়সা এবং গায়ের গহনা খুলে দিয়ে দিতেন। এতটুকু কার্পণ্য করতেন না।

দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত যাপিত জীবনটা তারা নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন রাসূল (সা:) এর সুন্নত মোতাবেক। তারা কথাবার্তা, চলাফেরা, ঘর সংসার করা, পারস্পরিক মোয়ামেলাত, লেনদেন, সুখ সুবিধায়, অভাব-মুসিবতে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে রাসূল (সা:) এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলেছেন। আজ আমরা যারা নিজেদেরকে রাসূল (সা:)-এর উম্মত বলে দাবী করি। আমাদেরও চলতে হবে রাসূল (সা:) এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী। জীবন চলায় পথের সব সমস্যা সমাধান নিতে হবে আল কোরআন থেকে- সুন্নাতে রাসূল (সা:) থেকে। তবেই মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে দুনিয়া ও আখেরাতে- আর পাওয়া যাবে রাসূল (সা:)-এর সাফায়াত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমীন-সুম্মা আমীন ॥

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত বই সমূহ

০১. আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি
০২. দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
০৩. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
০৪. জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
০৫. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
০৬. ভালোবাসা পেতে হলে
০৭. মহিমান্বিত তিনটি রাত
০৮. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
০৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ্ তায়ালার জবাব
১০. চরমোনাই'র পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
১১. কি শেখায় মহররম
১২. আমরা কেমন মুসলমান?
১৩. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?
১৪. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমীন জীবনের লক্ষ্য
১৬. কিছু সত্য বচন
১৭. নামাজ জান্নাতের চাবি
১৮. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
১৯. আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
২০. জান্নাতী দল কোনটি?
২১. বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত
২২. ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর?
২৩. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
২৪. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
২৫. সুনামী উপন্যাস
২৬. সোনালী ডানা (কাব্য)
২৭. আমার পৃথিবী খুব সুন্দর (কাব্য)
২৮. শত এক নামে ডাকি যে তোমায়
২৯. হিরামন পাখি (ছোট গল্প)
৩০. স্বপ্নের বাড়ী (ছোট গল্প)
৩১. আমার অহংকার (কাব্য)
৩২. ঈমান ও আমল (প্রবন্ধ সংকলন)
৩৩. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
৩৪. নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
৩৫. আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই
৩৬. স্বস্তির বাতিঘর
৩৭. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
৩৮. কবে আসবে সেই শুভ দিন
৩৯. শাফায়াত মিলবে কি?
৪০. নারী-পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী
৪১. কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজি
৪২. ভুবন্ত পুরুষ
৪৩. কিশোরী উম্মুল মুমেনীন
৪৪. আল কোরআনের গল্প শোন
৪৫. মৃত্যুর আগে ও পরে প্রিয়জনদের করণীয়
৪৬. স্বভাব হবে সুন্দর ও রুচিশীল
৪৭. রাসূল (সাঃ) আমার ভালবাসা
৪৮. রোদ জোসনায়
৪৯. অন্য রকম কষ্ট
৫০. আল্লাহর রঙে রঙিন হবো
৫১. যা পড়ি তা বুঝতে হবে

www.pathagar.com